তাবা হাইটস থেকে মোজেসের পথে

প্রীতি সান্যাল

পনেরোই জুলাই। ফ্রান্স গরমে ধুঁকছে। হঠাৎ দুম করে ঠিক হয়ে গেল আমরা যাব লোহিত সমুদ্র রিভিয়েরা তাবা হাইটসে। গা ছমছম করে উঠল। এখানেই তো কয়েক বছর আগে জঙ্গী বোমায় ট্যুরিষ্টরা মারা গিয়েছিল। শার্ম এল শেখ, দাহাব তাবা নামগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। ততক্ষণে ট্যুর টিকেট কাটা হয়ে গেছে। ফেরবার পথ নেই। এক সপ্তাহের ছুটি কাটাবার কথা। মনএজেন্স অর্থাৎ আমার এজেন্ট ভ্রমণ সংস্থা থেকে ব্যবস্থা করেছে চাটার্ড বিমানে। মন সায় দিচেছ না একেবারে। অথচ গত বছর লুক্সরে বেড়াবার সময় একেবারও মনে পড়ে নি ১৯৯৭ সালের জঙ্গীদের হাতে ভ্রমণবিলাসি মানুষগুলির প্রাণ হারানোর কথা। আসলে ঠিক এই সময়ে শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে রক্তাক্ত তান্ডব ঘটনা। বেয়রুটে বোমাবর্ষণ চলছে। জ্বলছে হিংসার আগুন। লোহিত সাগরের জল তো নামেই লাল। সেখানে কি আবার ঘটে! বেড়াবার আগে যে আনন্দ আর ঔৎসুক্য থাকে তা ছিল না একেবারেই। সবসময় মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটবে। ঠিক এই সময় টেলিভিশনে ছবি দেখছি মুম্বাইএর ষ্টেশনে ষ্টেশনে জঙ্গী বোমার আক্রমণে ভয়াবহ ছবি, খবর পাচ্ছি ভূ স্বর্গ কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া ভ্রমণবিলাসী বাঙালিদের মৃত্যু। পিঁপড়ের মুখে একদানা চিনি বয়ে বেড়ানোর মতো এই যে জীবন তাকে বশে রাখি এমন সাধ্য আমার নেই বুঝতে পারলাম। প্রাক ভ্রমণ পর্ব্বের আশংকা দুর না হলেও আবছা হয়ে এল।

মানচিত্রের কোথায় যাচ্ছি দেখতে গিয়ে বুঝলাম গন্ডগোল একটা হলেও হতে পারে। ভৌগলিক অবস্থান জানাই আপনাদের। তা হলে বুঝবেন আশংকা অকারণ ছিল না। উপসাগর আকোবা অনেকটা নীচে এসে লোহিত সাগর। একেবারে গা ছুঁয়ে ইজরায়েল, সিনাই মরুভূমি বাঁ দিকে, সোজা জর্ডান আর ডান দিকে সৌদি আরব। এইখানে পাহাড় আর মরুভূমি ঘেরা জায়গায় তাবা হাইটস। শহর বলা যাবে না, গাঁও নয়। চারটি হোটেল আছে শুধু। সাগর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বিলাসি হোটেল হায়াত, মারিয়ট, সোফিতেল। আমরা যাব সোফিতেল হোটেলে। সুটকেস একটি আর হাতব্যাগ নিয়ে আমরা দু জনে এখন শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টের পথে। গাড়ীচালক পর্তুগালের। বেশ গল্পগাছা ভালবাসে। গাড়ীতে রেখেছে ল্য পোঁয়া পত্রিকা। কভারে ঝকমক করছে ঐশ্বর্য্য রাও এর মুখ। ভেতরে মিত্তালের সাক্ষাৎকার, পশ্চিমবঙ্গের ওপর লেখা। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য কিনেছে শুনে বেশ মনটা চনমনে হয়ে উঠল। রাস্তা খালি। ১৪ই জুলাইয়ের উৎসব ক্লান্ত প্যারিস, বিশ্বকাপ হারানোর দুঃখে বিষন্ন শহর, ছুটিতে খালি হয়ে যাওয়া নির্জন প্যারিস --- অনেক আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। এখন টার্মিনাল সি তে লাইনে দাঁড়িয়েছি। পেছনে কৃষ্ণাঙ্গ বাবা মা তিন ছেলে নিয়ে অপেক্ষায়। আলাপ পরিচয় হল। মা টোগোর মেয়ে বাবা বেনিনের। এরাও তাবা হাইটসের যাত্রী। রাত বারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা। উড়োজাহাজ এখন আকাশে। কোন পথ ধরে চলেছে হদিশ পেলাম না। নিশ্চয় লেবাননের ওপর দিয়ে নয়। তবে সিনাই মরুভূমির ওপর দিয়ে তো বটেই। আমের রস দিয়ে আপ্যায়ন মিশরীয় বিমানসেবকের।

অবশেষে শার্ম এল শেখ বিমান বন্দরে নামলাম। এখানে বদল করতে হবে। চড়তে হবে ক্ষুদে উড়োজাহাজে। ভিসা কোথায় তোমাদের ? মিশরীয় যুবকের প্রশ্ন কাউন্টারে। আমরা জানালাম প্যারিসের এজেন্ট টাকা নিয়েছে ভিসার জন্যে আর জানিয়েছে এখানেই ভিসা দেওয়া হবে। তর্ক বিতর্ক চলল। তারপর একএক করে যাত্রীরা এগিয়ে যেতে থাকল। সান্যালমশাই অবশেষে ভিসা পেলেন। তখন দৌড়ে গিয়ে উড়োজাহাজ ধরা। দুটির মধ্যে একটি যাত্রী ভরা। অপরটিতে যা হোক করে দুটি আসন পাওয়া গেল। হাতবাক্স থেকে গেল বিমান সুন্দরীর কাছে। তখনও ভাবছি কিছু একটা অঘটন ঘটতে পারে হয়তো।

দু ঘন্টার পথ। নীচে বালি আর বালি। মরুভূমি পেরিয়ে চলেছি। সিনাই পেনিনসুলা। হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে শুন্যতা। গাছ নেই, ঘাস নেই, রুক্ষ পাঁশুটে বালি। দেখলে গা ছমছম করে ওঠে। মাঝে একবার চমকে উঠল নীল সমুদ্র। লোহিত সাগর। তারপর আবার সেই বালির ওপর দিয়ে ওড়া। এসে নামলাম তাবা হাইটস বিমান বন্দরে। এখানে অপেক্ষা করছে বিশাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস। এক ঘন্টা লাগবে হোটেলে পৌঁছতে। দু'ধারে পাথরের দেওয়াল হয়ে দাঁড়ানো কি বিচিত্র আকারের পাহাড়। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ এমন জনমানবহীন, গাছ পাতা ঘাস কিছু নেই, এক অপার ভয়ংকর শুন্যতা। যেন চাঁদের পাহাড় আর তারই গিরি কন্দর গিরিখাত। পোড়া পাথরের সারি কি বিচিত্র আকারে পাহাড় হয়ে দাঁড়ানো। ভয় করে। দেখে মনে হচ্ছে এখানে কোনদিন মানুষের শ্রমের চিহ্ন পড়ে নি, এমন কি একটি বন্যপ্রাণীরও দেখা মিলবে না। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর চোখে পড়ল দু একটি উট প্রায় পত্রহীন অলিভ গাছের দিকে গ্রীবা উঁচিয়ে দাঁড়ানো। বেদুইনদের দু একটি কালো তাঁবু ছাড়া মনে হয় এ মরুভূমি তিনহাজার বছর ধরে এক রকম অবস্থায় আছে --- গাড়ীতে গাইড আহমেদ মাইক্রোফোনে সিনাইএর কথা বলে চলেছে। সিনাই নামটি হয়তো এসেছে চাঁদের দেবী সিন থেকে যাকে এ মরুদেশের প্রাচীন মানুষেরা পূজো করত। কুড়ি মিলিয়ন বছর আগে মিশর, সিনাই আর আরব পেনিনসুলা এক অখন্ড ভূমি ছিল। তারপর বিশাল ভূ কম্পনে ভেঙে আলাদা হয়ে যায়, দক্ষিণ সিনাই পেনিনসুলা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু টি উপসাগর রচে দেয়। পশ্চিমে সুয়েজ খাল, গভীরতা পঁচানব্বই মিটার আর পুবে আকাবা উপসাগর যার গভীরতা আঠারোশ মিটার। আমাদের হোটেল সোফিতেল এই উপসাগরের ধারে। অতীতের এই ভূ আলোড়নে কম্পনে সিনাইএর পাহাড় আঁকাবাঁকা হয়ে অদ্ভুত দাঁড়ানো কতোদিন থেকে। এখানে পাহাড়ের উচ্চতা ৭৫০ মিটার থেকে দু হাজার ছয় শত মিটার পর্য্যন্ত। বলতে পারা যায় সিনাইএর এই দক্ষিণ দিক এক বন্য সৌন্দর্য্য নিয়ে দাঁড়ানো, কতো রকমের পাথর, তাদের রঙের বৈচিত্র্য ও রঙহীন শুন্যতা যেন এ দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের কথা বলে চলেছে যে ইতিহাসে এক নির্জন সৌন্দর্য্য।

ক্লান্ত লাগছে। চোখে পড়ল হঠাৎ লোহিত সাগরের নীল জল। মনটা চনমনে হয়ে উঠল। সোনালি বালি গিয়ে মিশেছে নীল সমুদ্রে, সেখানে ঝুঁকে দাঁড়ানো মারিয়ট হোটেল। তাকে ঘিরে গাছপালা দিয়ে সাজানোর চেষ্টা চলছে। বেশ কয়েক বছর লাগবে এখনো। এ পর হায়াত হোটেল, একই দৃশ্য। একটা বাঁক ঘুরতে চোখে পড়ল হালকা গোলাপি রঙের গম্বুজের মতো সোফিতেল হোটেল। এখানে সবুজীকরণ ভালই করেছে। সবুজ লন, ফুলের কেয়ারি, পাম গাছের সারি, যুঁই আইভি লতা, রঙ্গন গাছে লাল টুকটুকে ফুল আর নানা রঙের জবা। বাস ঢুকতেই দেখি গম্বুজের ধারে সশস্ত্র প্রহরী ছয়জন। একটা কিছু ঘটবে ভেতরে গুঞ্জন উঠল। ততক্ষণে পৌঁছে গেছি হোটেলের প্রবেশ দরজায়। সুটকেস ইত্যাদির জন্য কোন ভাবনা করতে হলো না। সাদর আপ্যায়নে হাতে হাতে নানাবিধ পানীয়। টেবিল জোড়া কেক পেষ্ট্রি আরো কতো রকমের খাবার, চা কফি। আমরা সোফিতেল হোটেলের অনেকদিনের সদস্য। কার্ডও আছে তার। সেজন্য বেশী আপ্যায়ন।

দোতলায় বিশাল ঘর, চওড়া বারান্দা, সমুদ্র চোখের সামনে এলিয়ে পড়ে আছে, অপর দিকে সেই রুক্ষ পাহাড়ের সারি। ঠান্ডা ঘরের বিশাল বিছানা হাতছানি দিচ্ছে আরামে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য।

আমরা অধৈর্য্য সমুদ্র স্নানের জন্য। লিফট চলে গেছে নীচে যেখানে দরজা খুললেই দুটি বিশাল সুইমিং পুল, তার গায়ে কাফেবার, পানীর অফুরন্ত চাওয়ার পাওনা মেটাবার জন্যে তৈরী। তারপরই সমুদ্র। এখানে পরিচারকদের নাম বেশীর ভাগই আহমেদ, মুহম্মদ অথবা মুস্তাফা। আহমেদের হাতে একটি ডলার দিতে সে তোয়ালে এনে বিছিয়ে দিল সমুদ্রঘেঁষা লাউঞ্জ চেয়ারে। প্রতিদিন এ ভাবে এখানেই আমাদের আরাম শয্যা পাতা থাকবে জানাল। জল পরিষ্কার। নীল জলে মাছেরা অকুতোভয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। দুধারে দড়ির বাঁধন দেওয়া। এ পাশে ও পাশে প্রবাল প্রাচীর আর জঙ্গল। কিছু একটা ওখানেই ঘটবে তখনো ভাবিনি। যাই হোক বেশ খানিকটা সাঁতার দিয়ে জায়গাটা উপভোগ করতে শুরু করলাম। গরম আছে। কিন্তু একটা এলোমেলো সামুদ্রিক হাওয়া সজীব করে দিচ্ছে। এই অগাধ নীল সাগরের ওপারে জর্ডান, বাঁয়ে ইজরায়েল, ডানদিকে সৌদি আরব ভাবতে পারা যায় না। জল শুধু জল। ভূমধ্যসাগরের জলের মতোই নীল রং। স্রোত সরে গেছে। প্রবাল পাথরের বিচিত্র রং আর আকার দেখতে পাচ্ছি, প্রবাল ঝোপের পাতারা ঢেউএর ধাক্কায় অল্প দুলছে।

হোটেলে খাতির যত্নের অবধি নেই। যেন ট্যুরিষ্টদের সুখী করাই এদের কাজ। হাসি মুখের আপ্যায়ন ভালো লাগে। বেশীর ভাগ ট্যুরিষ্টই ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। দু বছর হলো ফরাসিদের চোখ পড়েছে। তারাও সংখ্যায় কম নয়। তা ছাড়া আছে ইতালীয়ান, আরব দেশের ট্যুরিষ্টদের হাতে গোনা যায়। ভারতীয় আমরা দু জন তবে ফরাসিদের সঙ্গে এসেছি বলে ফরাসিই ধরে নিয়েছে। যদিও সান্ধ্যভোজনে শাড়ী টিপ পরেই যাই। টেবিলে টেবিলে কতো রকমের যে খাবার। আমি হোটেল ম্যানেজারকে স্পেশাল খাবার পেতে পারি কিনা প্রশ্ন করাতে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন "নিশ্চয় পোলাও আর তন্দুরী -- নো প্রবলেম।" হেসে জানালাম একটু গ্রীল করা মুরগী আর সব্জী হলেই চলবে। পাঁচদিন রেস্তোরাঁতে ঢুকলেই ম্যানেজারের হাসিমুখে জিজ্ঞাসা --- "চিকেন অ্যান্ড ভেজ?" বাচ্চাদের জন্যে হাইচেয়ার, কান্না ও বায়না ধরা শিশুদের সান্ত্বনা দিয়ে খেলনা হাতে ধরিয়ে দিতে দেখেছি আগাদিরের মেয়ে রশিদাকে যে সববিষয়েই পটু। কখনো রিশেপসনে, কখনো রাতের জলসায় তার মতো কয়েকজন কর্মীকে অনলস হাসিমুখে কাজ করতে দেখেছি। রেড সী রিভিয়েরা হোটেলগুলি এদের জন্যেই আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে কিংবা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এতো ছোটাছুটি যাতে ভ্রমণবিলাসীরা দাহাবের, শার্ম এল শেখের তিনটি আত্মঘাতী বোমায় মৃত মুখগুলি ভুলে আবার দলেদলে আসতে পারে এই লোহিত সাগরের ধারে গড়ে ওঠা পাঁচতারার হোটেলগুলিতে অনেক কম খরচে।

পরদিন সকালে স্নর্কলিং করার জন্য জলে নামলাম। ডুব সাঁতারে জলের নীচে কি সৌন্দর্য্য ! প্রবাল পাথরের বাহারী রঙের হোরি খেলা, পিছলে চলে যাচ্ছে সবুজ পায়রা মাছ, কালো সাপের মতো ইল, কালো ফোঁটায় সাজানো বিরাট সুইটলিফট মাছ পাথরের আড়ালে, একদল ছাগলমাছ হলুদ পাখনা নাড়িয়ে এই মাত্র চলে গেল। প্রজাপতির মতো রঙ ছোট ছোট মাছগুলি নির্ভয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, আর ফায়ার প্রবালের ঝোপ লাল রঙে উজ্জ্বল বাহারী। গা ছমছম করছে ঠিকই কিন্তু উঠে আসা যায় না এমন তার আকর্ষণ। কিছু একটা ওখানেই ঘটবে তখনো ভাবিনি। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে চলুন আপনাদের নিয়ে যাই জলের গভীর থেকে পাহাড়ের উচ্চতায়।

একসঙ্গে থাকতে থাকতে পরিচয় গাঢ় হয় নানা দেশের মানুষজনের সঙ্গে। ম্যাগি তাদের মধ্যে একজন। হোটেলে রাতে সেদিন বেলিড্যান্স অনুষ্ঠান ছিল। সে আমাদের পাশে বসেছিল আঠারো বছরের কন্যাকে নিয়ে। ভেবেছিলাম এবারে ছুটিটা সমুদ্র নিয়েই কাটাব। কোথাও বেড়াতে যাব না। ইংরেজ মেয়ে ম্যাগির মুখে শুনলাম আগের দিনে তার মোজেসের পদচিহ্ন ধরে সিনাই মরুভূমির দিকে যাত্রা, মোজেস পাহাড় রাত কাটানো আর ভোরের সুর্য্যোদয় দেখা, নীচে নেমে সেন্ট ক্যাথরিণ মঠ দেখা। যখনই নাচ থেমে ঝমঝমিয়ে বাজনা বেজে উঠছে আমরা ফিসফিস করে বেড়ানোর গল্প করছি। তখনই ঠিক করা হলো আমরা যাব সেই মঠে। দু হাজার ছেচল্লিশ মিটার উচ্চতায় জেবেল ক্যাথরিন পাহাড়ে এই মঠ। বেড়ানোর প্রোগ্রাম আগে থেকেই হাজার সুর্য্যের এজেন্সী ঠিক করে রেখেছিল। আমরা তখন নাম লেখাই নি। এখন ছোট আহমেদের কাছে। সে জানাল একটি মিনি ভ্যান যাচ্ছে আগামী কাল ভোরে তিন বান্ধবীকে নিয়ে। আমরা দু জন যোগ দিলে পাঁচজনের যাত্রায় খরচ একটু কম পড়বে, মাথাপিছু পঁয়তাল্লিশ ইওরো। তাই সই। পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় প্রাতরাশ করে সাতটায় গাড়ীতে উঠলাম। ক্লেয়ার, অ্যানি আর মারী। তিন সখী বেড়াতে বেরিয়েছে স্বামীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে থাকে। বছরে একবার দেখা হয় একসাথে ছুটি নেওয়ায়।

চলেছি রেড সীর পাশ দিয়ে। অপর দিকে সেই রুক্ষ সিনাই পাহাড়ের সারি। এই সকালে তার থেকে একটা লালচে পাথুরে আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সমুদ্র, বালি আর পাথর এই সব মিলিয়ে এক অপায় নির্জনতার মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। পীচের রাস্তা শুধু আধুনিক জীবনের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। ক্বচিৎ চোখে পড়ে বাবলা আর অলিভ গাছ। শুধু নীল সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠছে প্রমোদ হোটেলগুলি। তার কাঠামো চোখে পড়ছে। নাম গুলিও লেখা হয়ে গেছে। শুধু গড়ে তোলায় অপেক্ষা। জনমানবহীন এই প্রত্যন্ত মরুদেশে কারা আসবে ? ক্লেয়ার বলল "কেন আমরাই। সোফিতেল গড়ে ওঠার আগে কেউ ভেবেছিল তিনশ ট্যুরিষ্ট ভীড় জমাবে এই বছরে আমাদের মত!" ক্যানিয়ন, স্কেপল্যান্ড হোটেল, ডলফিন বে, এডেন ক্যাম্প, সোনাটা বীচ রিসর্ট, সিন্ডারেলা, সমর বেদাইয়া --- টিনের পাতে লেখা নামগুলি পড়তে মজা লাগছিল। ভবিষ্যতের হোটেলগুলির জন্য গাছগাছালি লাগিয়ে সবুজীকরণের চেষ্টা চলছে। অদুরে রোদ্দুরে ঝলসে উঠছে রেড সীর নীল জল। পাহাড়ের মাথায় দু একটি বেদুইন ক্যাম্প, পাথর কেটে রাস্তা তৈরী করেছে তারাই।

চেকপোষ্ট পেরোলাম। এখানে পাসপোর্ট পরীক্ষা হল। সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। যেন এখনই কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। এগিয়ে চলেছি। বেদুইনদের চালাঘর পেরোলাম। বাচ্চারা ভিড় করে আছে। বিক্রী করছে পুঁতির মালা, চুড়ি, মাথার রঙীন ফিতে, ক্রিষ্টাল পাথর। ওদের উৎসাহ দিতে সবাই কিছু না কিছু কিনলাম। বাচ্চা মেয়েরা ছবি তোলাবার জন্য উৎসাহী। ওদের ভাষা বুঝি নি মুখের হাসি ছবিতে ধরা থাকল। ডেভিড লীনের লরেন্স অফ আরাবিয়া ছবিটা দেখেছেন হয়তো। তাহলে লেখার দরকার থাকত না সিনাই মরুভূমির নির্জন বালির চেহারা। পিটার ওটুলের প্রধান চরিত্রে অভিনয় তো মনে রাখার মতনই তার সঙ্গে ভোলা কঠিন এই মরুপ্রান্তর পার হয়ে যাওয়ার ফোটোগ্রাফি। আকোবা উপসাগর (যার ধারে গড়ে ওঠা হোটেল সোফিতেলে আমরা আছি) থেকে কায়রো যাওয়ার পথ। বালির ঝড়, অসহ্য গরম আর কুখ্যাত বালিয়াড়ির চোরা গর্তে বন্ধুকে হারানো ---- ছবিতে ঠিক এরকমই ছিল মনে পড়ছে। সিনাই --- এক সিংহদরজা --- আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্য্যন্ত চলে যাওয়ার ; ভূমধ্য সাগর আর লোহিত সাগরের মাঝে এক সেতু বন্ধন --- সোজা পথ ইওরোপ থেকে ভারত মহাসাগর পুর্ব্ব প্রাচ্য চলে যাওয়ার। বহুযুগ থেকে সিনাই পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপুর্ন ক্রসরোড। ইব্রাহিমের গলা মাইক্রোফোনে অহংকারী শোনাচ্ছে। মিশরের ফ্যারাওরা কতোদিন আগে সিনাই থেকে জেরুসালেম পর্য্যন্ত পথ তৈরী করেছিলেন। রোমানরা পুব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার মরুপথ সিনাইএর মধ্যে দিয়েই ব্যবহার করত যার নাম পরে হয় দারব এল - হাজি, তীর্থযাত্রার পথ যা মিশর থেকে সোজা মক্কা পর্য্যন্ত যাওয়ার রাস্তা ছিল। এখানেই ঈশ্বর কথা বলেন মোজেসের সঙ্গে, হাতে তুলে দেন পাথরে খোদাই টেন কম্যান্ডমেন্টস। এই বিশ্বাস টেনে আনছে তীর্থযাত্রীদের বহুযুগ ধরে সিরাইএর পাদদেশে। কাহিনী আছে হজরত মহম্মদের অশ্ব আল - বোরাক এখান থেকেই স্বর্গে উড়ে যায়। ক্রিশ্চান, ইহুদি, মুসলমান, সকলেরই বিশ্বাসের পবিত্রভূমি এখানে। তাছাড়া ভ্রমণ রোমাঞ্চ পেতে এ দুর্গম পাহাড়ী পথে আসে আরো কতোজন।

এই পর্ব্বতমালা, বালিয়াড়ি বালির পাহাড় সাধারণ চোখে এক নিষেধের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো যেন। বৃষ্টি হয় না, চাষবাস হয় না, দিনে অসহ্য গরম আর রাতে ঠান্ডা সবমিলিয়ে এক পরিত্যক্ত ভূমি মনে হবে। অথচ এই সব বাধা পেরিয়ে ইতিহাসে কাহিনী আছে বিশাল সৈন্যবাহিনী চলে যেত বিভিন্ন রাজ্যজয়ের তীব্র বাসনায়। ফ্যারাওরা সিরিয়া আর কানাআন বিজয়ের জন্য এই পথেই বাহিনী পাঠায় আর এই মরুপথ ধরেই এসেছে আসিরিয়ান, পারস্যীয়, গ্রীক, আরব, তুর্ক, নীলনদের শস্যশ্যামল উপত্যকা হাতের মুঠোয় পেতে।

আমরা এসে পৌঁছেছি চাঁদের আকারে দাঁড়ানো গ্রানাইট পাথরের *মোজেসের* পাহাড় আর *ক্যাথরিন* পাহাড়ের কাছে। বিশ্বাসীদের তীর্থযাত্রা এখান থেকেই শুরু হবে। এখন আর চলে যাওয়া নয় থামা। গাড়ী আর যাবে না। আমাদের মিনিট পনেরো পথ হাঁটতে হবে। পাহাড় এখানে প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছে। দেওয়ালে মৌচাকের মতো ছিদ্র যেন গবাক্ষ। ওখানে কারা বাস করে ? ক্ষয়ে যাওয়া পাথরগুলি নানা আকার নিয়েছে। এগিয়ে আসছে খ্রীষ্টিয় মঠ। এগিয়ে আসছে তীর্থযাত্রীরা মোজেসের পাহাড়চূড়ায় রাতের যাত্রা শেষ করে। তার মধ্যে দেখি একদল শাড়ী চটিতে আমাদের দেশের মেয়েরা। কেরালা থেকে এসেছিল তীর্থ পথ পরিক্রমায়। ফিরে যাচ্ছে সুর্য্যোদয়ের আশীষ নিয়ে। ম্যাগি বলেছিল জেবেল মোজেসে উঠতে দরকার একজোড়া শক্তপোক্ত জুতো। আমাদের পায়ে তা আছে। আমরা জেবেলে উঠব না। তাই কেরালার দলটির দিকে নিঃশব্দ সাবাস জানালাম।

পাথরের রং সবুজ লাল কালো। রোদ ঝলসাচ্ছে। গরম লাগছে না। দু হাজার ছেচল্লিশ মিটার উঁচু তাই আবহাওয়া আরামদায়ক। যে কোন তীর্থস্থানের মতোই নানা জিনিস বিক্রী হচ্ছে। জপের মালা, ক্রশ, মাতা মেরী, যীশু খ্রীষ্ট, মোজেসের ছবি, রক ক্রিষ্টাল। ''এই যে নিন মঠের ওপর বই, ক্রিষ্টালের মালা, মোজেসের কূয়োর পবিত্র জলের শিশি ---- বেদুইন বালকদের কলরব। নেবেন না ! পয়সা নেই ! তা হলে আপনার জামায় বেঁধা কলমটা দিন, আপনাকে পাথরটা দিয়ে দেব।'' কথাবার্তা ভাঙা ইংরেজীতে। কলমের বদলে ক্রিষ্টাল পাথর লাভ হোল। সামনে জেবেল মুসা পাহাড়ে ওঠার পাথর কাটা সিঁড়ি। সিঁড়ি এমন উঁচু যে দেখেই ওঠার বাসনা লোপ পেল পায়ে ঠিকঠাক জুতো থাকতেও। এই তীর্থপাহাড়ে বিশ্বাসীদের পদযাত্রা কতোদিন ধরে। আসে ক্রিষ্টান, ইহুদি আর ইসলামধর্মের মানুষ। মক্কা যাওয়ার পথ এখান দিয়েই। সিনাই পাহাড় তিনটি ধর্মের কেন্দ্রভূমি। জুডাইজম, ইসলাম আর খ্রিষ্টীয়। ধর্মগ্রন্থে এই পাহাড়কে ঘিরে কতো কাহিনী। ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরানে, খ্রিষ্টান বাইবেলে মোজেসের জীবনী লেখা আছে। তাই ইওরোপ এশিয়া থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে দলেদলে। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী ট্যুরিষ্ট তারাও ওঠে পাহাড় চূড়ায়। রাত কাটায়, ভোরের সুর্য সিনাই উপত্যকা আলোয় উজ্জ্বল করে তোলে তখন নেমে আসা।

অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। ইব্রাহিমের কথা শুনতে শুনতে পৌঁছে গেছি সেন্ট ক্যাথরিণ মঠের কাছে। ''মোজেসের পদচিহ্ন ধরে হাঁটা'' ---- ক্লেয়ারের গলা আবেগ মথিত। আমাদেরও কেমন একটা বিশ্বাসের মানস কঠিন পাহাড়ী পথে আরো একটু দ্রুত হাঁটার প্রেরণা জাগাল। মোজেসের জীবন অজানা নয়। তিনি মিশরের মানুষ, ধর্মে হিব্রু। ফ্যারাওদের ধর্মের থেকে আলাদা। একেশ্বরে বিশ্বাসী। চল্লিশ বছর বয়সে মিশর থেকে পালিয়ে আসেন সিনাইএর হোরেব পাহাড়ে। চোখের সামনে এখন আমরা যে জলের চৌবাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এখানে তৃষ্ণা নিবারণ করেন মেষপালক জেরথোর সাতকন্যার হাত থেকে। বিয়ে করেন বড়ো মেয়েকে। তারপর কেটে যায় চল্লিশ বছর। ভেড়া চরান আর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রতিদিনের প্রার্থনা ঈশ্বরের দেখা পাওয়ার। এখানেই রহস্যময় জ্বলন্ত ঝোপের কাছে দেখা পান প্রভুর। আগুনের শিখা গাছ ঘিরে, কিন্তু একটি পাতাও পুড়ছে না। বুঝতে পারলেন দৈব আবির্ভাব এখানেই। দৈব আদেশ এল মিশর থেকে হিব্রু সন্তানদের এখানে নিয়ে আসার আর তারপর এক প্রতিশ্রুত দেশে প্রতিষ্ঠিত করার। হাতে তুলে দিলেন দশটি বাণী দু টি পাথরে লেখা। টেন কম্যান্ডমেন্টস। তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠল তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন।

অদুরে মঠের দেওয়াল। প্রাচীন পাথর সেই একই বিশ্বাসের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়ানো। বেশ বড়ো মঠ। সন্তরা এখনো এখানে বাস করেন। তাই একটা সশ্রদ্ধ নৈঃশব্দ। এমন কি উঁচু গলার ইব্রাহিমও ফিসফিস করে কথা বলছে। প্রধান দরজা দিয়ে কালো আলখাল্লা পরা তিনজন সাধু বেরিয়ে এলেন কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে বিদায় জানাতে। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া গ্রীক ক্রিশ্চিয়ান তাঁরা। পুজো প্রার্থনা সেই নিয়মেই চলে আসছে। আমরা অন্য পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। পাঁচশ সাতাশি সালে তৈরী হয় এই খ্রীষ্টিয় মঠ। বাইবেলে বর্নিত বার্নিং বুশের গায়ে সেইন্ট ক্যাথরিণ মঠ পৃথিবীর প্রাচীনতম সতত বসত করা মঠ। জীবন্ত ইতিহাস। তৃতীয় শতক থেকে এখানে খ্রিষ্টীয় উপস্থিতি।

মঠে পুজো শুরু হয়েছে। প্রার্থনা সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। জননী মেরীর আশিষ ভিক্ষা।

সান্তা মারিয়া
দয়া ভিক্ষা তোমার চরণে
সর্ব্বজনের গতি হে ভবতারিণী
মোছাও চোখের জল শক্তি দাও দুর্ব্বল ভক্তকে
আলেলুইয়া

সাংতা, অক্সিলাম এইসব শব্দের উচ্চারণে ভাষা গ্রীক মনে হল। আমাদের তিন সঙ্গিনী ফরাসিতে অন্য অনেকের সঙ্গে গাইছে তখন।

আমরা এখন সেই আগুনের ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। লম্বা গুঁড়িতে পাতাগুলি ওপরে সবুজ মুকুটের মতো সাজানো। ইব্রাহিম বলল এ এক মরুভূমির কাঁটা ঝোপ, নাম রুবুস স্যাংতাস, কাসিয়া সেনা বলেও ডাকে অনেকে। গোলাপের মতো ফুল ফুটে আগুন রং তখন পাহাড়ে জ্বলতে থাকে। তবে অবাক হলাম শুনে যে অনেক চেষ্টা করেও এ গাছ অন্য কোথাও পুঁতলেও বাঁচে নি। ''দৈব বৃক্ষ বলেই হয় নি'' মারীর কথা। ''এই দেখ না পাতা একটা ছিঁড়ব বলে গাছে হাত দিতেই কাঁটা ফুটল। তিনটি কাঁটা সযত্নে বার করে প্যাকেটে রাখলাম। সততই আমাকে রক্ষা করবে জীবন কাঁটার জ্বালা যন্ত্রণা থেকে।'' মনে পড়ল দু বছর হলো তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। বিশ্বাসী মন সান্তনা খুঁজে ফিরছে অন্য কোথাও।

সেন্ট ক্যাথরিন গির্জা তৈরী হয়েছিল চার শতকে। রোমের সম্রাজ্ঞী হেলেনা তখন খৃষ্টীয় ধর্মে আকৃষ্ট। একটি ছোট গির্জা তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলেন। তীর্থস্থান হয়ে উঠল যখন আলেকজান্দ্রিয়ার অভিজাত বনেদী পরিবারের মেয়ে ডরোথি দুশ চুরানব্বই সালে জন্ম নিলেন। বড়ো হওয়ার পর দীক্ষা নিলেন খৃষ্ট ধর্মে। অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। তিনশ পাঁচ সালে শিরশ্ছেদ শাস্তি। কাহিনী আছে যখন তিনি শহীদের বলি হচ্ছেন তখন রক্তের বদলে উৎসারিত হয় ক্ষতস্থান থেকে দুগ্ধধারা। কবর দেওয়া হল। পাঁচ শতক পেরিয়ে গেছে। সিনাইএর এক সন্ত স্বপ্ন দেখলেন এখানে পাহাড় চূড়ায় দেবদুতেরা বহন করে এনে রেখেছেন কুমারী ক্যাথরিণের মৃতদেহ যা তখনো অক্ষত। তাঁরা কয়েকজন ওপরে উঠে দেখেন পড়ে আছে করোটি যার থেকে ঝুলছে সোনালি চুলের গুচ্ছ, দেহের হাড়গোড়। দেহ থেকে নিঃসারিত হচ্ছে এক সুগন্ধি নির্য্যাস যা শিশি বোতলে রাখা হল পবিত্রতায়। মঠের দোকানে বিক্রী হয় ছোট ছোট শিশি যাতে রাখা থাকে এক সুগন্ধি পারফিউম যা গাছের রস থেকে তৈরী, লেবেলে লেখা সন্ত ক্যাথরিণ। পবিত্র ভুমিতে তীর্থযাত্রায় আসা ক্রুসেডার ফিরে গিয়ে ইওরোপে এই কাহিনী ছড়ায়। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে এই সন্ত জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর দেহ নামিয়ে আনা হয় জেবেল ক্যাথরিণ গির্জায়, তাঁরই নামে পরিচিত এই মঠ যা দেখতে আমরা ভীড় জমিয়েছি। ট্রান্সফিগারেশন গির্জার ভেতরে বেদীর কাছে অলংকৃত কফিনে রাখা আছে তাঁর করোটি সোনা হিরে মুক্তো পান্নার

টায়রায় আর রাখা আছে বাম হাত অলংকার খচিত। প্রতি পঁচিশে নভেম্বর পালিত হয় সন্ত ক্যাথরিণের শহিদ হওয়ার দিনটি পুজোয় মিছিলে।

ভেতরে ঢুকলে মনে হবে এক মধ্যযুগীয় গ্রামে ঢুকেছেন ; বাড়ীগুলো ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ানো কিন্তু প্রতিটি বাড়ীর আকার, শৈলী, গঠন সম্পুর্ণ আলাদা। ছোট উঠোন, সিঁড়ি, বাড়ীগুলি ঘিরে গ্যালারী, উঁচু চূড়োর মতো ছাদ, সরু বারান্দা, গোলাকার তোরণ, শিল্পখচিত খিলান, অলিন্দ, ঘন্টাঘর, পাশ দিয়ে উঠে গেছে মসজিদের মিনার ---- কোন কিছুই যেন সাজানো হয় নি। অগোছালো ভাব। তা সত্তেও একটা হারমণি আর আত্মিকতার ছাপ দেখতে চাইলে চোখে পড়ে। এই মঠের ভেতরে লাইব্রেরী দেখার জন্য দুরদেশ থেকে পন্ডিতেরা আসেন। ভ্যাটিকানের পরেই এখানে বহুসংখ্যায় সংগ্রহ আছে প্রাচীন লেখা পুঁথিপুস্তক, হাতে লেখা ধর্মগ্রন্থ গ্রীক, কপটিক অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় খ্রিষ্টান ভাষা, আরবীয় আরমেনিয়ান, হিব্রু আর সিরিয়া ভাষায় লেখা চিরন্তন সম্পদ। ইওনেস্কোর মানব উত্তরাধিকার তালিকায় এই পাঠাগার। হজরত মহম্মদের লেখা ডিক্রীটি দেওয়ালে। এই মঠ সুরক্ষিত রাখার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। ঘরে ঘরে শিল্পসুষমা --- মোজাইকের কাজে, গয়নার অলংকৃত শিল্পে, রুশি আর গ্রীক আইকনে কি অসাধারণ প্রতিমা, বাইবেলের কাহিনী আঁকা ! অবাক করে দেওয়া সংগ্রহ। ছশ শতকের মোজাইক কাজে রচিত যীশু খ্রীষ্ট দেওয়ালে গ্রীক শিল্পের পরিচয় দিচ্ছে। বাইজানটাইন শিল্পে ছাপ নানা আইকনে। আমার সবথেকে ভাল লেগেছে কুমারী মা মেরী শিশু যীশু কোলে, খ্রীষ্টের স্বর্গাহোরণ, মোজেস, সন্ত ক্যাথরিণ আর সেন্ট জন দি ব্যাপটিষ্ট। লেখায় পরিসর এতো নেই যে সবগুলি লিখে জানাতে পারি। শুধু ডাক দিতে পারি এই মঠে এসে দেখুন কতোদিন আগের রচনা এখনো কতো উজ্জ্বল।

এবার ফেরার পালা। রোদ তেতে উঠেছে। মোজেসের জলাধার থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মুখে চোখে ছেটালাম। বেদুইন তাঁবুতে চা পান আর নুয়াবেতে সাগরতীরে ঢেউএর দোলানি দেখতে দেখতে ড্রীমল্যান্ড রেস্তোঁরায় এদেশী খাবার খাওয়া। গাড়ী চলল বেদুইন গাঁয়ের দিকে। মঠ গির্জা, মোজেসের পায়ের চিহ্ন পড়া পথ ফেলে আবার পাহাড়ী পথে যাত্রা। তাঁবুতে মিন্ট চা আর রসালো খেজুর খেয়ে বিশ্রাম। তারপর নুয়াবের সাগর পাড়ে। সিঁড়ি নেমে গেছে সাগর অব্দি। পাশে মাটিতে জাজিম আর কুশন পেতে বসার জায়গা। তরমুজের রস দিয়ে গেল হাতে হাতে। তারপর এলাহি খাবার। ফালাফেল --- বীন বেঁটে কোপ্তা, খাবলি পালো --- অ্যাপ্রিকট দিয়ে ভেড়ার মাংস। সঙ্গে খুবজ রুকাক জোয়ান ছেটানো তন্দুরী রুটির মতো খেতে। সামাক বি তাহিনা কি ভালো খেতে। তিল ছড়িয়ে পমফ্রেট মাছ ভাজা। মাছের নাম সী ব্রিম। মিচোটেতা হলো আমাদের রায়তার মতো, মিষ্টি এলো বালিলা --- বার্লি পুডিং ওপরে পেস্তা বাদাম ছড়ানো। এরপর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তবু জলে নামলাম। এখানে প্রবালপ্রাচীরের নাম আছে। কিছুক্ষণ স্নর্কলিং করে ফেরার সময় দেখি অসাবধানতায় মাস্ক টিউব দুটোই হারিয়েছে। কয়েকজন বালক জলে ডুব দিয়ে খুঁজে ফিরছে। আমরা উঠে আসার সময় মালিক সালাম জানিয়ে বলল আগামীকাল ভাঁটার সময় নিশ্চয় পাওয়া যাবে। গাইডকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। ওর কথায় অবিশ্বাস করল সবাই আমিও। অঘটনের সম্ভাবনা ওখানেই হয়ে থাকল। হোটেলে ফিরতে রাত হলো। অন্ধকার পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ী চলেছে, কিন্তু ভয় করছিল না আমাদের। আসলে অন্য ভয় অপেক্ষায় ছিল।

পরদিন হোটেলের বুটিক থেকে আবার স্নর্কলিংএর মাস্ক টিউব কিনে তাবা হাইটসএর সাগর পাড়ে। আহম্মদ সযত্নে তোয়ালে বিছিয়ে রেখেছে। বার থেকে টনিক জল একবোতল যথারীতি দিয়ে গেছে। অল্প হাওয়া দিচ্ছে। নিরীহ আলস্যে রোদ আর ছায়া উপভোগ করার মতো দিন। বিকাশ গেছেন অফিসে ইন্টারনেট চেক করতে। আমি জলে নামলাম। রঙীন মাছেরা, প্রবালের লাল সবুজ কমলা ঝোপ ঈশারায় হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে। আমি মাস্ক, টিউব, পায়ে জলজুতো পরে দু ধারে সাবধানী দড়ির গন্ডীর মধ্যে মুখ ডোবালাম। জলে রঙের খেলা চলছে মাছেদের সাঁতারে, কখনো নিঃসঙ্গ বিশাল মাছ পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দেয় কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে চোখের সামনে দিয়ে জলদৌড়। জলপরীদের জগৎ। অ্যাঞ্জেলফিশ --- নীলে সবুজে হলুদে কি যে সুন্দর। দুরে চলে যাচ্ছে। প্রজাপতি মাছ অনেক একসঙ্গে খেলা করছে। গর্গগনিয়ান সী ফ্যান কোরালের কমলা সবুজ জঙ্গলে ডুবছে ভাসছে --- এ এক অন্য জগৎ। নেশা ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে মাছ চেনাবার জন্যে গাইড ছিল। কাজেই ভয়ের কিছু নেই বলে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ খেয়াল হল আমি একা। একেবারে প্রবাল প্রাচীরের কাছে কেমন করে চলে এসেছি জানি না। দুরে গাইড অন্যদের নিয়ে ডুব দিচ্ছে। জোয়ার আসছে তখন। আমি একটা গোল বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেছি যেন। ফিরতে চাইছি পারছি না। একই জায়গায় সাঁতার দিচ্ছি এক ইঞ্চিও এগোতে পারছিনা। পাশেই প্রবাল পাথরের চাঁইগুলোকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। জলের মধ্যে কালো কমলা লাল পাথর যেন রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। একটা বড়ো লাল আর নীলে মেশানো বড়ো মাছ পাথরের আড়াল থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যতোবার ফিরবার চেষ্টা করছি জোয়ারের ঢেউ মাথার ওপর আছড়ে পড়ছে। জল খাচ্ছি আর ভয় পাচ্ছি। অঘটন তা হলে এল জলেই। আমি কি ডুবে যাচ্ছি ! অসম্ভব। এই তো টানটান সাঁতারে পৌছে যাব নিরাপত্তার আশ্রয়ে গাইডের কাছ পর্য্যন্ত। বুঝতে শুরু করলাম বিপদ আসছে। জল প্রবাল জলজ প্রাণী কিছু ভাল লাগছে না, ভয় করছে, স্নায়ু টানটান হয়ে আছে, যে কোন সময় ভয় আমাকে গ্রাস করবে। তার আগে হাত তুলে হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করার শেষ চেষ্টা করা যাক। তাই করতে থাকলাম। বুঝতে পারছি জলের আওয়াজে সে কথা সাগরে নামা মানুষের কানে যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখি এক দীর্ঘদেহী মানুষ ফিরে তাকালেন। আমি সমানে হাত নাড়ছি। এগিয়ে এসে বললেন ''সাঁতারে এগিয়ে এসো।'' তারপর অবস্থা বুঝে এগিয়ে এসে হাত ধরে জলের মধ্যে দিয়ে আমাকে সাঁতারে এগিয়ে যেতে বললেন। ততক্ষণে হোটেলের দু জন আরক্ষ প্রহরী এগিয়ে আসছে। ওদের হাত ধরে বালির ওপর যখন দাঁড়ালাম তখন ঘুরে তাকিয়ে দেখি কি সর্ব্বনেশে জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। যেখানে যেতে মানা ছিল সেখানেই।

ফিরছি যখন হঠাৎ দেখি ম্যাগি এসে জড়িয়ে ধরে বলছে ''ঠিক আছ তো ! আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম।'' তখন তাকিয়ে দেখি দু পায়ে প্রবাল প্রাচীরের হিংসার রক্তছাপ। কেটে ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। একটি ছিপছিপে মহিলা বললেন ''আমার স্বামী তোমাকে বাঁচিয়েছেন। তোমার হেল্প চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে জলে নেমে খবর দিই। ভাল আছ দেখে আশ্বস্ত লাগছে।'' ততক্ষণে বিকাশ, হোটেলের ডাক্তার, ম্যানেজার সবাই জড়ো হয়েছে। কাটা ছেঁড়ায় ওষুধ লাগানো হল। তারপর ঘরে ফিরে শাওয়ার খুলে স্নান। বিছানায় পড়ে টানা চার ঘন্টার ঘুম। একটা অদ্ভুত ভয় জড়িয়ে থাকল তার পর থেকে। তবু পরদিন সমুদ্রস্নান করেছি ভয় কাটাতেই। অবশ্যই রেড সীর সামুদ্রিক জীবন দেখতে সবাই আসবেন। স্কুবা ডাইভিং, স্নর্কলিংও করবেন। এ এক আশ্চর্য্য জগৎ। কিন্তু সাবধান হতে হবে। গাইডের নির্দ্দেশে ডোবা আর ভাসা মানতে হবে।

বার্নিং বুশের একটা পাতা কুড়িয়ে ব্যাগে রেখেছিলাম। মারী সেটা দেখেছিল। সান্ধ্যভোজনে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল ''পাতাটা তোমাকে বাঁচিয়েছে বিশ্বাস রেখো।'' অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারত। জঙ্গী বোমায় বা জল নিমজ্জনে। কোনটাই ঘটেনি। প্যারিসে ফিরে এসেছি বেশ কিছুদিন হল। মারীর খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে উজ্জ্বল মুখ এখনো মনে পড়ে।

প্যারিস, ৩১ জুলাই ২০০৬

(মাসিক ভ্রমণ ২০০৬ এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত।)